প্রবোধকুমার সান্যাল

অণকুমার মুখোপাধ্যায়

১৯০৫ সালের ৭ জুলাই বড়োলাট কার্জনের আদেশে অখণ্ড বাংলা প্রথম বিভাজিত হয়। সেই রাতে জন্ম হয় কল্লোল গো ষ্ঠীর বিশিষ্ট সব্যসাচী লেখক প্রবোধকুমার সান্যালের। উত্তর কলকাতার এক নিম্নমধ্যবিত্ত পবিবারে তাঁর জন্ম। তিনি যখন স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে পড়েন তখন একবার বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন। কিন্তু ধরা পড়ে যাওয়ায় সেই কিশোরকে বা ড়ি ফিরিয়ে আনা হয়। এই ঘটনা তাঁর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি অনবরতই ভ্রাম্যমাণ ছিলেন। সারা জীবনের তিনি বহু দেশ ঘুরেছেন। উত্তর কলকাতার সিটি কলেজ থেকে তিনি গ্রাজুয়েট হন (১৯২২), তার পরই অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেবার জন্য অল্প সময় কারাদ্ধ ছিলেন। তার পর নিম্ন - মধ্যবিত্ত সংসারের যুবকটিকে জীবিকার অন্বেষণে বেতে হয়। মিলিটারি অ্যাকাউন্টস অফিসে (১৯২৩-২৭) রাওয়ালপিণ্ডিতে কাজ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক, মাছ - ব্যবসায়ী, পোষ্ট অফিসের কেরানি, মিলিটারি অ্যাকাউন্টস অফিসের কেরানি--- নানা বিচিত্রকাজ করেছেন। কোনোট াতেই লেগে থাকেন নি। স্বাধীনতা আন্দোলনের শরিক হন আইন অমান্য আন্দোলনের সময় (১৯২৮-৩০)। দুবারই স্ব ল্পসময়ের জন্য কারাবরণ করেছিলেন। তার পর তাঁর জীবনযাত্রার পথ বদলে যেতে থাকে। রাজনীতি থেকে প্রবোধকুমার সান্যাল চলেআসেন সাহিত্যক্ষেত্রে। 'কল্লোল', 'দুন্দুভ', 'উপাসনা', 'বিজলী', 'স্বদেশ', 'খেয়ালী' প্রমুখ মাসিক সাহিত্য পত্র ও সমসাময়িকপত্রে চাকুরি করেছেন অথবা স্বেচ্ছাকর্মী রূপে যুক্ত ছিলেন (১৯৩০-৩৭)। এই সময়টার সাংবাদিক ও সা হিত্যিকরূপে তাঁর শিক্ষাপর্ব। ঘুরেছেন অজস্র, লিখেছেন অজস্র, নানা ধরনের লেখা -- সংবাদ - রচনায় ও সাহিত্য - রচন ায় তাঁর হাতে খড়ি হয়েছে এই সময়টাতে। তার পর দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার রবিবারের ম্যাগাজিন - অংশের সম্প াদকতা করেন (১৯৩৭-৪১)। কিন্তু কোনো চাকুরিতেই তিনি স্থিত হন নি। শেষ পর্যন্ত তিনি সর্বক্ষণের সাহিত্যকর্মী হয়ে গেলেন, সেইসঙ্গে মুসাফির--- যাযাবরের জীবন তাঁকে অনবরতই টানত। মাঝে মাঝেই তিনি সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেন।

প্রবোধকুমার সান্যালের গ্রন্থসংখ্যা ১৫৫। তার মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যা ৮০, অসংখ্য ছোটোগল্প। প্রবন্ধ, অন্যান্য সাংবা দিকসুলভ রচনা এবং ভ্রমণগ্রন্থ। বস্তুত অন্নদাশংকর রায়ের 'পথেপ্রবাসে' (১৯২৯) ভ্রমণ গ্রন্থের পর প্রবোধকুমার সান্য ালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' (১৯৩৩) বাংলা সাহিত্যসমাজে সাড়া জাগিয়েছিল। প্রথমটি প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা' মাসিকপত্রে (১৯২৬-২৯), গ্রন্থরূপে বেনোর সময় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভূমিকা লেখেন প্রমথ চৌধুরী। 'মহাপ্রস্থানের পথে' যখন 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় তখনই পাঠকসমাজে সাড়া জাগিয়েছিল। ভ্রমণগ্রন্থ রচনার একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করেছিলেন প্রবোধকুমার--- হিমালয় ভ্রমণের মধ্যপথেযাত্রীর (লেখক) সঙ্গে পরিচয় ঘটে অপূর্ব সুন্দরী রাণীর। সেই পরিচয় অনেক দূর গড়িয়েছিল, তবে ভ্রমণকাহিনির নিয়ম মেনেই একদিন তাতে ছেদ পড়ে যায়। 'মহাপ্রস্থানের পথে'র সা হিত্যগৌরব কম নয়। একজন নিম্নবিত্ত বাঙালির হিমালয় যাত্রারূপে খ্যাত এই বইটিযখন চলচিচত্র - রূপ পায় তখন তা দর্শকসাধারণের মন কেড়ে নেয়।

হিমালয় নিয়ে তাঁর আগে পরে অনেকেই লিখেছেন কিন্তু 'মহাপ্রস্থানের পথে'র জনপ্রিয়তা কমে নি।

প্রথম বিশ্বসমরের পর যে আর্থিক অশিচয়তা ও সামাজিক টালমাটাল তা ভারতবর্ষ নামক উপনিবেশকে অস্থির করে

তুলছিল । সেই অস্থিরতা সঞ্চারিত হয়েছিল বাংলার তাণ্যে। তার ফল আমরা দেখেছি গোকুলচন্দ্র নাগ ও দীনেশরঞ্জন দ াস - সম্পাদিত পরিচালিত মাসিক 'কল্লোল' পত্রিকায় (১৯২৩) এবং তার পদাংক - অনুসারী মুরলীধর বসুর 'কালি কলম' (১৯২৭) আর ঢাকা থেকে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসু - সম্পাদিত 'প্রগতি' মাসিকপত্রে (১৯২৮)। এই তিনটি পত্রিকায় গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছিলেন এক ঝাঁক তণ বাঙালি লেখক--- প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। তাঁদেরই টানে এসেছিলেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, অন্নদ াশংকর রায়। এঁরা প্রত্যেকেই পরবর্তী তিন দশকের বাংলা সাহিত্যে অগ্রণী লেখকরূপে উঠে এসেছিলেন।

প্রবোধকুমার সান্যালের প্রথম বই 'যাযাবর' (১৯২৮) যতটা না উপন্যাস তার চেয়ে বেশি জীবনের নানা স্কেচের সমাবেশ। এটাই তাঁর কথাশিল্পীরূপে খ্যাতি বা অখ্যাতি দিয়েছিল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বেদে' উপন্যাসটি সে - সময়েই বের হয়। এ নিয়ে শনিবারের চিঠিতে সজনীকান্ত দাসের ক্ষুরধার মন্তব্য--- একজন বলে, বে' দে (বিয়ে দে), অপরজন বলে, যা যা বর (বরকে যাও বলেভাগিয়ে দেয়)। কিন্তু সজনীকান্ত দাসের ক্ষুরধার ব্যঙ্গ প্রবোধকুমার, অচিন্ত্যকুমারকে দমাতে পারে নি, যেমন পারে নি জীবনানন্দ দাশ নামক কবিকে।

প্রবোধকুমারের এক গুচ্ছ গল্প বেরিয়েছিল 'কল্লোল' আর 'কালি কলম' -এ। সেগুলি নিয়ে বেল তাঁর প্রথম গল্পসংকলন--- 'নিশিপদ্ম' (১৯৩১)। পর পর বেল 'কাজললতা' (১৯৩১), 'কলরব' (১৯৩২)। এর পরেই প্রকাশিত হল প্রবোধকুম ারের অশেষ পাঠকপ্রিয়তাঋদ্ধ উপন্যাস 'প্রিয় বান্ধবী' (১৯৩৩)। সেটির পাঠকপ্রিয়তা আজ তার কল্পনা করা যায় না। মহ াপ্রস্থানের পথে'র চলচিচত্ররূপ যেমন দর্শকপ্রিয় হয়েছিল, 'প্রিয়বান্ধবী' ও তেমনি প্রিয় হয়েছিল।

বস্তুত উপন্যাস লেখক প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস পথ রেখাটির সূচনা হয়েছিল 'প্রিয় বান্ধবী'তে। এক জোড়া ভবঘুরে (বোহেমিয়ান) তণ-তণীর জীবন উপভোগ। তাদের চিন্তাধারা শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়। তাদের জীবনও কোনো আদর্শে স্থিত নয়। অথচ তাদের জুটেছিল অবিশ্বাস্য পাঠকপ্রিয়তা।

পর পর প্রকাশিত হল প্রবোধকুমারের উপন্যাস--- 'নদ ও নদী' (১৯৩৮), 'আঁকাবাঁকা (১৯৩৯)। এ দুটিতে প্রিয়বান্ধবী উপন্যাসের পথানুসরণ করা হয়েছে।

কিন্তু 'হাসু - বানু' (১৯৩২) উপন্যাসে একটি অন্য ধারা সূচিত হল, জীবন ও বাস্তবতার একটি নতুন রূপ দেখা গেল। দেশবিভাগ জনিত রক্তস্নাত পুব ও পশ্চিমবঙ্গের পটভূমে চিত্রিত এই উপন্যাসের নায়িকা একটি--- মুসলিম মেয়ে, হাসুবানু, হিন্দু মুসলিম এই অনর্থক রক্তপাত ও মৃত্যুকে ঠেকাবার ব্যর্থ প্রয়াস করেছিল। 'হাসুবানু'র বক্তব্য ছিল সিরিয়াস। সেদিনের পূর্ব পাকিস্তানে তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

প্রবোধকুমার সান্যালের প্রথম উপন্যাস 'প্রমীলার সংসার', কিন্তু তা প্রকাশিত হয় অনেক পরে ১৯৪৩ সালে। সেকারণে 'যাযাবর' তাঁর প্রথম উপন্যাসরূপে গৃহীত যদিচ তা সঠিক বলতে গেলে উপন্যাস নয়, জীবনের নানা স্কেচের সমাবেশ। ১৯২৭ - ১৯২৯ সালের মিলিটারি অ্যাকাউন্টস-এর কেরানিগিরি করে তিনি কলকাতায় চলে আসেন ১৯২৯ সালে। ক ারণ সাহিত্য তাঁকে ডাকছিল। সেই সঙ্গে তাঁকে ডাক দেয় ভবঘুরে জীবন। দুয়ে মিলে প্রবোধকুমার। 'প্রিয়বান্ধবী' 'নদ নদী', আঁকা বাঁকা', 'হাসুবানু', --- এখানেই তাঁর উপন্যাস-যশ শেষ নয়। পরবর্তীকালে আরো উপন্যাস লেখেন। 'দেশ' পত্রিক ার প্রথম সংখ্যা থেকে লেখেন 'জয়ন্ত' উপন্যাস। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস--- 'অগ্রগামী' (১৯৩৬), 'তুচ্ছ', 'বনহংসী' 'পুষ্পধনু' 'বেলোয়ারী', 'উত্তরকাল', 'শ্যামলীর স্বপ্ন' এবং আরো অনেক। একটা সময় 'মাধুরী দেবী' ছদ্মনামে বছর কয়েক বিভিন্ন পত্রিকায় লেখেন।

কথা সাহিত্যিক প্রবোধকুমার বড়ো না ভ্রমণকাহিনীর লেখক বড়ো, ছোটোগল্প - লেখক সফল নয়, স্মৃতিমূলক স্কেচ - জ াতীয় আখ্যানলেখক সফল --- এই - সব নিয়ে বিতর্ক আছে। এ বিতর্কের মীমাংসা এখানে জরি নয়। প্রবোধকুমার যে অ াবেগপ্রবণ, জীবনাগ্রহী ভবঘুরে শিল্পী, তাতে সন্দেহ নেই। শেষ পর্যন্ত তিনি উপন্যাসলেখক, বা গল্পলেখক, বা ভ্রমণাখ্যান-লেখক রূপে টিঁকে থাকবেন, তা নিয়েও বিতর্ক হতে পারে।

এ বিষয়টি বিবেচনা করলে মনে হয় গল্পলেখক ও ভ্রমণ কথা লেখক রূপেই তিনি টিকে থাকবেন।

প্রবোধকুমার ছিলেন জন্ম - ভবঘুরে। অষ্ট্রেলিয়া আর দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া দুনিয়ার সর্বত্রই তিনি ঘুরেছেন। ইয়োরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, এমন-কি উত্তর মে ও তাঁর ভ্রমণক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল।

আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গেও তিনি কিছুকাল যুক্ত ছিলেন। 'দেশ' পত্রিকায় তিনি ধারাবাহিক লেখেন 'জয়ন্ত' উপন্যাস 'দেবতাত্মা হিমালয়' ও আত্মকথা--- 'বনস্পতির বৈঠক'। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম শারদীয় সংখ্যা লিখেছিলেন গল্প। ১৯৮০ সালে পেয়েছিলেন আনন্দ পুরস্কার। অমৃতবাজার পত্রিকা গোষ্ঠী - প্রদত্ত 'মতিলাল পুরস্কার'ও পেয়েছিলেন। সেইসঙ্গে 'শরৎ পুরস্কার'।

১৯৩৮ সালে প্রবোধকুমারের পিতৃবিয়োগ হয়। এই শোক তাঁকে একটা বড়ো ধাক্কা দিয়েছিল। একটু বেশি বয়সেই তিনি বিবাহ করেন (১৯৩৯)।

ভ্রমণ প্রবোধকুমারের প্রিয় আকর্ষণ। ভারত নেপাল, বর্মা, তিববত, ভুটান, দক্ষিণ - পুর্ব এশিয়া, রাশিয়া, হিমালয়ে বিস্তৃতঅঞ্চল, কৈলাশ, মানস সরোবর ঘুরেছেন। আরো ঘুরেছেন পাকিস্তান, তাসখন্দ, এসিয়া - ইয়োরোপের নানা প্রান্তে। প্রবোধকুমার লিখেছেন মহাপ্রস্থানের পথে, (১৯৩৩) 'দেবতাত্মা হিমালয়', (১৯৫৫), 'উত্তর ভারত চরিত' (১৯৬৫)। 'গঙ্গাপথের গঙ্গোত্রী' (১৯৬২), 'দক্ষিণ ভারতের আঙিনায়' (১৯৮৪) ও 'রাশিয়ার ডায়েরি' (১৯৬২)।

সারা দুনিয়া ঘুরে ১৯৭৮ সালে বেড়াতে গিয়েছিনল কোরাপুটে (ওড়িশায়)। সেখানে এক দুর্ঘটনায় পড়েন। তার পর থেকেই শয্যাশায়ী হয়ে যান। তার পরে হার্ট অ্যাটাক হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৮৩ সালের ১৭ এপ্রিল বালিগঞ্জ টেরাসে ৭৮ বছর বয়সে তাঁর শেষ নিশ্বাস পড়ে। স্ত্রী, দু পুত্র, তিন কন্যা ও অসংখ্য ভক্তপাঠক রেখে তিনি চিরবিদায় নেন।

প্রবোধকুমারের উপন্যাসের সংখ্যা কম নয়। সেগুলির মূলধন প্রবল জীবনাবেগ আর - এক ধরনের রোমান্টিকতা --- একথা অস্বীকার করা যায় না। তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য অনুধাবনযোগ্য

"উপন্যাসের অতিপ্রসার ও মাত্রতিরিক্ত জনপ্রিয়তার যুগে এমন অনেক লেখক উপন্যাসক্ষেত্রে আকৃষ্ট হন, যাঁহাদের চিওমনীষা ঠিক উপন্যাসের স্বভাবধর্মের অনুবর্তী নহে। আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিম - যুগে এ জাতীয় লেখক সঞ্জীবচন্দ্র। আমার মনে হয় যে, প্রবোধকুমার সান্যালকেও এই শ্রেণীর লেখকদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে এইচ. জি.ওয়েলস ও জি.কে. চেস্টারটন ও এই পর্যায়ে পড়েন। ইঁহাদের জীবন - কৌতুহলের মধ্যে একটু নির্লিপ্ততা, একটা কল্পনার মায়া - লীলা লক্ষ্য করা যায়। জীবন সম্বন্ধে একটা বিশেষ উপপত্তি (থিওরি) লইয়া সমাজ - বিন্যাসের একটা অচিন্তিত পূর্ব রূপ - কল্পনার প্রেরণায় ইঁহারা জীবন - পর্যালোচনায় অগ্রসর হন। ইঁহারা জীবনকে দেখেন হয়তো সত্যানুগ দৃষ্টিতে। কিন্তু একটু তির্যক ভঙ্গিতে। জীবনের ভালো - মন্দ, হাসি - কান্না,নিয়ম - বিশৃঙ্খলা সব লইয়া ইহার সমগ্রতা হইতে ইঁহারা রস আহরণ করেন না, জীবনের যতটুকু খণ্ডাংশে ইঁহাদের পূর্বনির্ধারিত মানস - কল্পনা সমর্থিত হয়, ততটুকুর প্রতি ইঁহাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। জীবনকে ইঁহারা দেখেন, কিন্তু একটু সূক্ষ্ম ব্যবধানের অন্তরাল হইতে; নানা অপ্রত্যাশিত অবস্থার মধ্যে ইহার যে অতর্কিত বিকাশ ঘটে, তাহাতেই তাঁহাদের সত্যিকার আগ্রহ। জীবনগ্রন্থের কয়েকটি পাতা, জীবন - নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যাবলী অবলম্বন করিয়াই বিশিষ্ট জীবনদর্শন গড়িয়া উঠে। মানবিক রসের গাঢ়তাকে অন্তরের ভাব - কল্পনার সংযোগে কিঞ্চিত ফিকে করিয়া, উহার পরিচিত স্বাদে নূতন মশলার সাহায্যে কিছুটা অনাস্বাদিতপূর্ব বৈচিত্র্যের সঞ্চার করিয়া। ইঁহারা এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শোষিত রসটিই তাঁহাদের উপন্যাসে পরিবেশন করিতে ভালোবাসেন।" (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,৪র্থ সং, ১৩৬৯, পৃ ৪৭৫-৪৭৬)।

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বিচার আপাত রূঢ় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এর সত্যতা অস্বীকার করা সুকঠিন। প্রবোধকুমার সান্যালের কয়েকটি উপন্যাসের বক্তব্য, বৃত্ত ও চরিত্র সামান্য আলোচনা করলেই তা অনুধাবন করা যায়। এক জোড়া বোহেমিয়ানতণ - তণী আপত উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়, তাদের জীবনে সম্বল যৌবনের উচ্ছ্বাস আর জীবনের প্রতি আবেগ, যা শেষ পর্যন্ত তাদের কোথাও পৌঁছেও দেয় না। এই রোমান্টিক বোহেমিয়ান জীবনচিত্র আর যৌবনের বাধাবন্ধহারা উল্লাসের রঙিন চিত্র পাঠককে মুগ্ধ করে, কিন্তু জীবন সম্পর্কে কোনো বোধে উত্তীর্ণ করে না। ভাষার বেগে ও লালিত্যে যৌবনের রঙিন আলিঙ্গনে পাঠকচিত্ত মোহিত হয়। জীবনে কোন্‌টা সম্ভব, কোন্‌টা অসম্ভব, কোন্‌টা স্বাভাবিক কোন্‌টা অস্বাভাবিক, তা নিয়ে প্রবোধকুমারের চরিত্ররা মাথা ঘামায় না। তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা (অধিকাংশই তণ - তণী) নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে চলে, এক রঙিন আদর্শের। (হোক তা অবাস্তব) দিকেলক্ষ্য রেখে তারা চলতে থাকে। সমাজের কোনো শাসন তারা মানে না, মানব - মানবীর নানা বিচিত্র সম্পর্কের লীলাচাঞ্চল্যে তারা আন্দোলিত হয়। যৌনাবেগ - মুক্ত এক

সহজ জীবন - আনন্দ সম্বল করে তারা চলে। যেমন, শ্রীমতী ও জহর ('প্রিয়বান্ধবী') মায়ালতা ও সুরপতি (অগ্রগামী)। বরং 'তুচ্ছ' ও 'বনহংসী'তে বাস্তবালেখ্য আছে, কিন্তু কোনো যুক্তিগ্রাহ্য পরিণত নেই।

কল্লোল - গোষ্ঠীর তিন গল্পকার পথে ঘাটে বন্দরে গঞ্জে হাটে গল্প খুঁজে বেড়িয়েছেন। তাঁরা হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত আর প্রবোধকুমার সান্যাল।

নিজের গল্প সম্পর্কে প্রবোধকুমারের মন্তব্য--- 'পথেঘাটে গল্প খুঁজে বেড়িয়েছি--- স্টিমার - ঘাটে, চটকলের ধারে, রেল স্টেশনে, বিদেশের ধর্মশালায়, মফস্বলের ওয়েটিং মে, তীর্থপথের মেলায় --- আমি গল্পের বিষয়বস্তু খুঁজতুম।'

এইভাবে পথেঘাটে গল্প খুঁজে বেড়িয়েছেন তাঁর পূর্বে ও পরে অনেকেই --- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে আজকের রামকুমারমুখোপাধ্যায়, ঝড়ের চট্টোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। তবে প্রজন্মে প্রজন্মে এই গল্প খুঁজে বেড়ানো আর তা রূপদানের শিল্পকর্ম বদলে গেছে। সেইসঙ্গে বদলেছে জীবন - ভাবনা।

প্রবোধকুমারের ভ্রমণকাহিনিতে উপন্যাসে ছোটোগল্পে ভবঘুরের রোমান্টিকতা ও বাঁধন - হারা জীবনোল্লাস বার বার দেখা গিয়েছে। প্রবোধকুমার তাঁর সমগ্র সাহিত্যজীবনের ও কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই কর্মের সংসারের বিভিন্ন দায়িত্ব থেকে মুক্তি নিয়ে ঝিভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন। বিচিত্র দেশ, বিচিত্র লোকজন, বিচিত্র নিসর্গ তাঁকে চুম্বকের মতো টানত। সেই পথ - পরিক্রমায় তাঁর ঝুলি ভরে উঠত বিভিন্ন বিচিত্র জীবন - অভিজ্ঞতায়। তারই ফসল তাঁর ছোটো গল্প, সমকালের নিজ দেশের পারিপার্শ্বিকতার দায় তিনি অস্বীকার করেন নি, কিন্তু অচেনা বন্দরে বা স্টেশনে একটি কিশোরীর সঙ্গে হঠাৎ-দেখার অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি হয়েছে প্রবোধকুমারের বিচিত্র গল্প।

প্রবোধকুমার কল্লোল - গোষ্ঠীর লেখক, সেইসঙ্গে কল্লোল - পরবর্তী পর্বেরও লেখক। আট-নয় বছরের (১৯৩৯-১৯৪৭) দ্রুত পরিবর্তমান পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে তাঁর গল্পে। দ্বিতীয় বিশ্বসমরের সূচনা থেকে স্বাধীনতা - প্রাপ্তি ও দেশবিভাগ --- অল্পবিস্তর দশটি বছর বাংলার সমাজে ও রাষ্ট্রের কালান্তরের পর্ব এক অস্থির স্বৈরবৃত্ত কাল তার সমস্ত বিক্ষোভ, সংশয়, অশান্তি ও সুতীক্ষ্ণ জীবন -জিজ্ঞাসার স্বাক্ষর রেখে গেছে এই পর্বের ছোটোগল্পে। কল্লোল - পর্বের রোমান্টিকতা, বোহিমীয় মনোভাব ও নোঙর - ছাড়া প্রেমের অভিযান এই পর্বে অনুপস্থিত। এই পর্বে আমরা শুনতে পাই কামানের গর্জন, পেরিয়ে যাই শোণিত - রঞ্জিত পথ, শুনতে পাই দুটি অন্নেরজন্য হাহাকার।

প্রবোধকুমারের গল্পে জীবনের এই দুই রূপেরই পরিচয় পাই। 'কয়েক ঘন্টা মাত্র' (১৯৩২), 'দিবাস্বপ্ন, 'সায়াহ্নে (১৯৩৩),'বন্যাসঙ্গিনী' (১৯৩৪), 'অঙ্গার' (১৯৪৩), 'আদি ও অকৃত্রিম' (১৯৪৪) প্রমুখ গল্প প্রবোধকুমারের উপরি - উক্ত দুই ধরনের জীবনবোধের পরিচায়ক। আরো বিশদ করে বলা যায় সেদিনের (১৯৩৯ - ৪৭) পরিবর্তমান সমাজ, ভাঙন ও বিপর্যয় সম্পর্কে কোনো গল্পলেখকই অনবহিত থাকতে পারেন নি। প্রবোধকুমারের 'বনমানুষের হাড়', 'বন্যাসঙ্গিনী', 'ক্ষয়', 'পুতুল', 'কল্পান্ত', 'অঙ্গার' গল্প এরই পরিচায়ক।

একটা সময়ে বেঙ্গল পাবলিশর্স থেকে পর পর চার বছর (১৩৫১, ১৩৫২, ১৩৫৩, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে) চারটি 'সেরা গল্প' সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমটির সম্পাদক ছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিতীয়টির সরোজকুমার রায়চৌধুরী, তৃতীয়টির নবেন্দু ঘোষ, চতুর্থটির বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। এই চার বছর (১৩৫১ থেকে ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ, ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৭ খৃস্টাব্দ) বাংলা গল্পের মুকুরে সেদিনের সমাজের দ্রুত পরিবর্তমান চেহারা ধরা পড়েছে, সূচিত হয়েছে দিনবদলের পালা। সেদিনকার বাংলা ছোটোগল্পের তথা গল্পলেখকের চেহারা ও মানসিকতার প্রতিনিধি স্থানীয় হয়ে উঠেছিল এই চারটি সংকলন। 'বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, অন্তর্দৃষ্টিতে, বলিষ্ঠ মানসিকতার প্রতিনিধি স্থানীয় হয়ে উঠেছিল এই চারটি সংকলন। জাতি ও সমাজের দৈন্য, দুর্দশা এবং সংগ্রামাত্মক রূপ ফুটেছে এর কোনো কোনোটিতে, আবার কোনোটিতে মানব - মনের নিভৃত সহায়কটিকে উন্মোচন করা হয়েছে।'

চারটি সংকলনেই একটি সুর বিশেষভাবে বেজে উঠেছে --- তা সমাজচেতনার সুর -- মন্বন্তরপায়িত বাংলার মর্মভেদী কান্না। সেইসঙ্গে একটি আশার বাণী --- রবীন্দ্রনাথের কবিতায় শুনি তার উচ্চারণ 'এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান / বীভৎস্য তাণ্ডবে,/ স্থান হলে নিরাসক্ত মনে, আজ সেই সৃষ্টির আহ্বান / ঘোষিছে কামান।' সংকলিত গল্পগুলিতে সেই কামান - গর্জন আছে।

প্রবোধকুমার সান্যালের 'মুখবন্ধ' গল্পটি সংকলিত হয়েছে ১৩৫২-র সেরা গল্প সংকলনে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের

পটভূমিতে রচিত এই গল্প। কলকাতা থেকে ছিটকে শিবু গ্রামে এসে দাঁড়াল। বছর তিনেক পূর্বে সে গ্রাম থেকে চলে যায় কেউ তার খোঁজ করে নি। এ এক নতুন শিবু। এ যুদ্ধে লোকের অন্নবস্ত্র জুটছে না, মহামারী রোগে চারদিক শ্মশান হয়ে চলেছে--- তার মাঝখানে সেনগুপ্তদের শিবু - এসে পোড়ো ভিটে বাড়ি সারিয়ে বাড়িঘর তুলছে। গ্রামের লোকেরা হতবাক হয়ে গেল। দরিদ্র শিবু আজ ধনাঢ্য। শিবু অঢেল টাকা ছড়ায়, গ্রামের উন্নতি ঘটাতে চায়। গ্রামের লোকের কাছে সে আর শিবু নয়। শিবুবাবু। গ্রামের লোকেরা অভিভূত হল, অভিজাত ছোটো লাহিড়িদের পরিবারের খুড়ি মা তার মেয়ে লাবণ্য শিবুর বিয়ে ভদ্রতার ঔদার্যে আর টাকা ছড়ানোয় অভিভূত হয়ে গেল। বুড়িমা ও লাবণ্যকে মুগ্ধ করে শিবু তাদের কলকাতা গিয়ে এল। তাদের দুজনের তাক লেগে গেল। তিন বছরে শিবু এত টাকা করেছে---, বাগানবাড়ি, নিজের মোটর গাড়ি। শিবু ভাবে, ছোটো লাহিড়ির সেই মেয়ের(লাবণ্য) কী পর্বতপ্রমাণ আত্মাভিমান। আজ তো তারা গরীব, তবু এত গর্ব কিসের। কলকাতার শ্রেষ্ঠ অভিজাত পল্লিতে শিবুর প্রাসাদ। মা মেয়ে যত দেখে তত অভিভূত হয়। বুড়িমাকে শিবু জানাল মিলিটারি কন্ট্রাক্ট জোগাড় করেই তার এত অর্থ। শিবু চায় লাবণ্য তার অর্থে দম্ভে অহমিকায় মুগ্ধ হোক। যেমন করে হোক লাবণ্যর গর্ব ভাঙতেই হবে। কত টাকা খরচ করলে খুড়িমা আর লাবণ্যর পারিবারিক আত্মাভিমানকে গুঁড়িয়ে দিয়ে তার চিত্তের প্রসন্নতা জয় করা যায়। লাবণ্যর দাম কত টাকা। লাবণ্যর অভিজাত্যবোধের উগ্রতা ক্রমে নেমে আসে। নিউমার্কেটে ঘুরে লাবণ্য অভিভূত হয়।শিবুর কাছে লাবণ্য আসে। শিবুর মোটরেই লাবণ্য বেরিয়ে পড়ে। শিবুর মনে উল্লাস--- শিবু লাবণ্যকে তার বাগানবাড়িতে নিয়ে এসে বশ করতে চায়। কিন্তু লাবণ্য হাত ছাড়িয়ে চলে যায়। পরদিন শিবুর কাছে লাবণ্য আসে। শিবুর মোটরেই লাবণ্য বেরিয়ে পড়ে। শিবুর মনে উল্লাস --- লাবণ্যর সেই আত্মাভিমান আর আভিজাত্যবোধ কোথায় গেল। কিন্তু শিবুর বাগানবাড়িতে এসে লাবণ্য আড়ষ্ট হয়ে যায়।শিবু তাকে কিনে নিতে চায়। সেই আত্মগর্বী মেয়েটা আজ কতবার শিবুর পিঠে ঘাড়ে হাত রাখল। কিন্তু শিবুর প্রস্তাবে লাবণ্য রাজি নয়। মাকে গ্রামে পাঠিয়ে সে শিবুর কাছে থাকবে না।

তাই, দুচোখে আগুন ঠিকরিয়ে লাবণ্য চেঁচিয়ে ওঠে --- তুমি মিথ্যেবাদী, জোচ্চোর, প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক। মা, এই বেইমানকে বিশ্বাস করা যায় না

শিবুর মতলব খুড়িমা ধরতে পারেনি , লাবণ্য ধরেছে। অতএব খুড়িমা ও লাবণ্যকে শিবু পত্রপাঠ গ্রামে ফিরিয়ে দিতে চাইল। যাবার খরচ বাবদ একশো টাকা দিতে চাইল। এবং তখনি তার অন্তর্ধান। "ওপাশে তখন লাবণ্য পাথরের মতো বসে আত্মগ্লানিতে, অনুশোচনায়, ক্লেদক্লিনতায় যেন একটা আদি অন্তহীন নরককুণ্ডের মধ্যে পড়ে অন্ধের মতো আঁকুপাকু করছে।" এখানেই 'মুখবন্ধ' গল্পটি শেষ।

'অঙ্গার' গল্পের আছে আর - এর বীভৎস চিত্র। যুদ্ধের সময়কার কলকাতার অভাবের তাড়নায় এক সম্ভ্রান্ত মহিলা অধঃপতনের শেষ ধাপে উপনীত। তার আর্তনাদে আত্মগ্লানিতে ভরে উঠেছে গল্পের বাতাস।

অনেক সময় মনে হয় কে বেশি পাঠকপ্রিয়--- কথাসাহিত্যিক প্রবোধকুমার, না ভ্রমণকাহিনিকার প্রবোধকুমার ?

বাংলা হিমালয় ভ্রমণ সাহিত্য দিনে দিনে পুষ্টি লাভ করছে। জলধর সেন ('হিমালয়'), উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ('গঙ্গাবতরণ' প্রমুখ দশটি গ্রন্থ) প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ('যমুনোত্তরী হতে গঙ্গোত্রী ও গোমুখ') চিত্তরঞ্জন মাইতি ('শৈলপুরী কুমায়ুন'), শঙ্কু মহারাজ (দশটি গ্রন্থ), স্বামী রামানন্দ ভারতী ('হিমালয়'), সুজিত চট্টোপাধ্যায়, প্রীতি চট্টোপাধ্যায়, শিবতোষ মুখোপাধায়, নবনীতা দেবসেন, প্রাণেশ চক্রবর্তী, ভগীরথ মিশ্র প্রভৃতি নাম এখানে মনে পড়ে।

এর মধ্যে প্রবোধকুমার সান্যাল নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উপস্থিত। তাঁর 'মহাপ্রস্থানের পথে' ও 'দেবতাত্মা হিমালয়' গ্রন্থের পাঠকপ্রিয়তা আজও কমে নি। 'দেবতাত্মা হিমালয়' গ্রন্থের অংশ বিশেষ, ইংরেজিতে অনুবাদ করে তিনি পাঠিয়েছিলেন জওহলাল নেহকে এবং নেহ তাঁর একটি ইংরেজি মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন। এই সময়টায় খুব কাছের থেকে প্রবোধকুমার সান্যালকে দেখি ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিয়োতে। হিমালয়ের ছবি বাছাই ও নেহকে ইংরেজি অনুবাদ পাঠানোর ব্যাপারে তখন তিনি অস্থির ও অধীর ছিলেন। তাঁর ব্যগ্রতা তখন উপস্থিত সকলেই ছুঁয়ে যাচ্ছিল।

'মহাপ্রস্থানের পথে' সম্ভবত 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্রে ১৩৩৯-১৩৪০ বঙ্গাব্দে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে। আজ থেকে প্রায় পঁচাত্তর বছর পূর্বে প্রবোধকুমার কেদার

- বদ্রী ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তখন পায়ে হাঁটা পথেই সবাই যেত। কাণ্ডি, ডাণ্ডি আর ঘোড়া--- এই তিন যানবাহনে তারাই যেত যারা ধনী। প্রবোধকুমার হরিদ্বার থেকে পায়ে হেঁটে বদ্রীনাথের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। সেদিন পৌঁছতে লেগেছিল ছাবিবশ দিন। এই ভ্রমণপথে কত নরনারীর সঙ্গে পরিব্রাজক প্রবোধকুমারের আলাপ - পরিচয় হয়েছিল। কেউ বৃদ্ধ, কেউ গ্ণ, কেউ সতী সাধবী, কেউ বেশ্যা, কেউ ব্রহ্মচারী,কেউ সন্ন্যাসী, কেউ বা মধ্যবিত্ত, কেউ নিতান্ত গরিব। সবাই কেদার - বদ্রীর উদ্দেশে যাত্রা করেছিল। হিমালয়ে অপূর্ব নিসর্গ আর পথ-চলতি নরনারীর সুখদুঃখের কাহিনী হয়ে উঠেছে 'মহাপ্রস্থানের পথে' এই কাহিনীতে প্রবোধকুমার কিছুটা রোমান্টিক উপাদানকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এক অপূর্ব সুন্দরী প্রবাসী বিধবা বাঙালি যুবতীকে নিড়ে গড়ে তুলেছেন এমন কে উপাখ্যান, যা কখনো কখনো তীর্ধযাত্রার কয়ট ও তীর্থমহিমাকে গৌণ করে দিয়েছে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত পরিব্রাজক লেখক তার রাশ টেনে ধরেছেন।

বস্তুত 'মহাপ্রস্থানের পথে' প্রবোধকুমারকে যে খ্যাতি ও পাঠকপ্রিয়তা দিয়েছিল তা আজো শেষ হয়ে যায় নি। পেপারব্যাক সংস্করণ তার অন্যতম প্রমাণ।

এই বইয়ের জন্য লেখক কেবল সাধারণ পাঠকের নয়, সাহিত্যের সমাজের রথী-মহারথীর প্রশংসা ও সাধুবাদ পেয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্র বসু লিখেছিলেন, "আপনি যে তীর্থ - ভ্রমণের একটা বাস্তব চিত্র আঁকিয়াছেন ইহার ফলেই বোধহয় আপনার ভ্রমণকাহিনী রস - সাহিত্য রূপান্তরিত হইয়াছে। মানুষের মন একটা বিচিত্র জিনিস--- কলিকাতার অন্ধ গলিতে অথবা তুষারধবস বদ্রীনাধের উপর মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি সহজে বদলায় না এবং চিত্তশুদ্ধি না ঘটিলে তীর্থযাত্রার কায়িক ক্লেশের কোনোও আধ্যাত্মিক মূল্য নাই। এ-সব কথা আপনার বইয়েরে মধ্যে বেশ ফুটয়েছে।"

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "তীর্থযাত্রা পথে তীর্থদেবতাগণ যে তোমার আচ্ছন্ন করে রাখেন নি, মুক্ত মন সহযাত্রীদের দিকে খুলে রাখতে পেরেছিল--- এ কথাটির চিহ্ সমস্ত লেখার মধ্যেই মেলে।"

প্রথম চৌধুরী লিখেছিলেন, "কেদার - বদ্রীর টান হচ্ছে একটা idea-র টান। দেবতাত্মা হিমালয় নামক নগরাধিরাজের প্রতি অনেক টান কালিদাসেরও ছিল, আমাদেরও আছে। আমাদের হিন্দুদের কাছে হিমালয় শুধু একটা পর্বত নয়। সেইসঙ্গে একটা বিরাটidea-র টান একরূপ চুম্বক প্রস্তরের টান।

এই কাহিনীও বটে। এ কাহিনীও হচ্ছে তাঁর সহযাত্রীদের কাহিনী। এই সহযাত্রীদের মধ্যে কেউ গাঁজাখোর কেউ ভবঘুরে। আর স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেউ বেশ্যা, কেউ দাসী, কেউ - বা পূর্ণযৌবনা ভৈরবী। লেখক অতি অল্পকথায় কলমের দুই চার আচঁড়ে ওদের ছবি এঁকেছেন অথচ এরা প্রত্যেকেই এক- একটি জ্যান্ত মানুষ হয়ে উঠেছেন।"

সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "এ বইয়ে তোমার দৃষ্টি তোমার মন, তোমারই ভাষা সমস্তই পথ - চলতি, পাঠকের মনকেরাস্তায় বের করে আনে। তোমার লেখা চলেছে শাস্ত্রিক পথ দিয়ে নয়, ভৌগোলিক পথ দিয়ে নয়, মানুষের পথ দিয়ে। কত শতাব্দী। ধরে দুঃসাধ্যসাধনরত মানুষের দুর্গম যাত্রার প্রয়াস নিরবচ্ছিন্ন বয়ে চলেছে--- এই তীর্থযাত্রা তারই প্রতীক। কিছুদিন সেই টানে তুমি চলেছিলে। ঘরে ঘরে সকল মানুষই পূর্বমানুষ - পরম্পরার নিরবচ্ছিন্ন অনুবৃত্তি; ছড়িয়ে আছে বলে তার সূত্রটা ধরতে পারা যায় না। কিন্তু ঐসংকীর্ণ গিরিপথে সংকীর্ণ লক্ষ্যের আকর্ষণে এই চিরকালীন মানব - প্রবাহের বেগটা সুপ্রত্যক্ষ। একই কামনা ও একই বিশ্বাসের, ঘনিষ্ঠতায় তারা সুদূর অতীত ও অনাগত যুগের সঙ্গে নিবিড় সংশ্লিষ্ট। এরা নানা প্রদেশের, নানা ঘরের, এরা বহু বিচিত্র অথচ এক-- এদের সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে সুখ ও দুঃখ, আশা ও অশাশঙ্কা, জীবন ও মৃত্যুর খাদ - সংঘাত --- এই যুগ - যুগান্তর পথের পথিক মানবচিত্ত আপন অশান্ত ঔৎসুক্যের স্পর্শে সঞ্চার করেছে তোমার লেখায়--- তার কৌতুক ও কৌতূহল পাঠককে স্থির থাকতে দেয় না।"

চারজনের চারটি অভিমতের অংশবিশেষ আমরা এখানে পাই। নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের অভিমত শ্রেষ্ঠএই বইটির অন্তর - গুণের সার্থক পরিচায়ক। বর্তমান নিবন্ধকার ধরে নিতে পারে, 'মহাপ্রস্থানের পথে' বহুপঠিত। প্রাণঘাতী চড়াই পেরিয়ে বহু কষ্টের পরযখন বদ্রীনাথ চোখের সামনে ভেসে উঠল তখনকার বিবরণটি চমৎকার--- "তার পর স্বপ্ন দেখছি। অর্ধ নিদ্রার আবেশে জেগে উঠল একটি রূপলোক, মায়াময় বিচিত্র অমরাবতী, সম্মুখে দূরে একটি বিপুল বিস্তৃত তুষারময় প্রস্তর , তারই একান্তে কুয়াশায় ঢাকা একখানি গ্রামের অস্পষ্ট চিত্র, মধ্যস্থলে মন্দিরের একটি স্বর্ণচূড়া স্রোতস্বিনী জলধারা।'

মনে হয় সৃষ্ট কথাসাহিত্যের তুলনায় ভ্রমণ কাহিনীর লেখক পরিব্রাজক প্রবোধকুমার সান্যাল পাঠকচিত্তে স্থায়ী আসন

পেয়েছেন।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com